ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম দখল অভিযান

মুখে সন্ত্রাস নির্মূলের কথা বললেও সন্ত্রাসীরাই রয়েছে ছাত্রদলের নেতৃত্বে। তারা দখল করে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়েছে ছাত্রলীগ...

রিপোর্ট করেছেন **সাইফুল ইসলাম রিপন**

রাত্রিশেষে গাঢ় অন্ধকার তখনো চারদিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। টেলিভিশনে চলছে নির্বাচনের ফল ঘোষণা। ১০টিও চূড়ান্ত ফল ঘোষিত হয়নি তখনো, তবে যে ক'টি আসনের আংশিক ফল ঘোষিত হয়েছে, তার প্রায় সব ক'টিতে এগিয়ে রয়েছে বিএনপি। এটুকুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেলো।

হলের ছাত্রলীগ নেতা আরিফ টিভি রুম ছেড়ে উঠে গেলো চারতলায় নিজের কক্ষে। তারপর ব্যাগ গোছানো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদায় জানানো। তার আধঘণ্টা পরই এলো ছাত্রদলের দু'জন কর্মী। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, কোমর খোলা শার্টের ভেতরে রাখা অস্ত্র তারা দেখায়নি। এমনকি হলের গেটে এসে হাঁক-ডাকও ছাড়েনি। শুধু চারতলায় ছাত্রলীগের মন্ত্রী পাড়ায় খবর পাঠিয়েছে 'আমরা এসেছি। তোমরা চলে যাও'। এতেই কাজ হয়ে যায়। পুরো হল রাত পোহানোর আগেই চলে আসে ছাত্রদলের দখলে।

টোকাই সাগরের ৬/৭ জন ক্যাডার বঙ্গবন্ধু হলে ও সেভেন স্টার গ্রুপের দ্বিতীয় সারির ৭/৮ জন ক্যাডার জিয়া ও মুহসীন হলে অবস্থান

এভাবেই গত ২ অক্টোবর ভোর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র পাল্টে যায়। ১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিলের পর যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হল ছিলো ছাত্রলীগের একচ্ছত্র ঘাঁটি, সেটিই রাত পোহানোর পর মুখর হয়ে ওঠে খালেদা জিয়ার বক্তৃতার ক্যাসেটে। নির্বাচনী ফলে বিএনপি এগিয়ে থাকার খবর পেয়েই অধিকাংশ হল থেকে সটকে পড়ে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। এ সুযোগে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুনের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জনের মতো ক্যাডার একে একে হল দখলের অপারেশন চালাতে শুরু করে এবং ১০টি হল ছাত্রদল দখল করে নেয়। দখলের বাকি থাকে শুধু জহুরুল হক হল।

ছাত্রদল প্রথমেই দখল নেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলটি। ক্যাম্পাসের উত্তরপাড়ার শেষ মাথায় অবস্থিত এ হলটি দখলের পর ছাত্রদল ঢুকে পড়ে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান

হলে। তারপর মামুনসহ বড়ো ক্যাডাররা আর নিজেরা অগ্রসর হয়নি। শুধু তাদের সহযোগীদের দিয়ে বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগ নেতাদের খবর পাঠাতে থাকে, 'আমরা এসেছি'। এতেই কাজ হয়। প্রায় বিনা বাধায় ছাত্রদল একে একে জসীম উদ্‌দীন হল, সূর্যসেন হল, শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল, এএফ রহমান হল ও মুহসীন হল দখল করে নেয়।

সকাল ৮টার দিকে ছাত্রদল নেতারা দু'জন ক্যাডার পাঠিয়ে দেন জহুরুল হক হলে। জহুরুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ছাত্রলীগ শরীয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের ক্যাডার মাঈনুদ্দিন বাবু তখন হলের প্রধান ভবনের দোতলায় তার লেফটেন্যান্টদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন। তারা তখনো জানে, যে, উত্তরপাড়ার সব হল ছাত্রদল দখল করে নিয়েছে। ছাত্রদল ক্যাডারদের মুখে সব শুনে বাবু হল ছাড়তে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, ছাত্রদলের যারা বৈধ ছাত্র তারা হলে থাকতে পারবে, কিন্তু হল দখল করতে এলে রক্তারক্তি হবে। এতে ফিরে যায় ছাত্রদলের ক্যাডাররা। কিন্তু প্রাথমিক বাধাটুকু দিয়ে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হল ধরে রাখতে পেরেছেন মাঈনুদ্দিন বাবু। পরে তার সঙ্গে যোগ দেয় শরীয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের আরো কয়েকজন ক্যাডার।

দুপুর ১১টার দিকে ছাত্রদলের ক্যাডাররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখলের সংস্কৃতিতে যুক্ত করে আরেকটি কালিমা লেপা ধাপ। এ সময় ছাত্রদলের ছাত্রী কর্মীরা মেয়েদের ৩টি হল দখলের সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগে কখনোই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে কোনো প্রকার দখল অভিযান চালানো হয়নি। ছাত্রী হল দখলের অংশ হিসেবে প্রথমেই ছাত্রদল নেত্রী শাম্মী আখতারের নেতৃত্বে কিছু ছাত্রী হলে ঢুকে ছাত্রলীগ নেত্রী মেধাকে মারধর করে তাকে হল থেকে বের করে দেয়। একই ভাবে কুয়েত-মৈত্রী হলে দু'জন ছাত্রলীগ কর্মীকে মারধর করা হয়। তারপর তাদের হুমকি-ধমকে রোকেয়া, শামসুন্নাহার ও কুয়েত-মৈত্রী ৩টি হল থেকেই ছাত্রলীগের অন্য কর্মীরা বেরিয়ে আসে। সম্পন্ন হয় দখল অভিযান। জানা গেছে, রোকেয়া হলের বর্ধিত ভবনে ছাত্রদল কর্মীরা তাদের দখলের কথা ঘোষণা করে পোস্টার সেঁটে দিয়েছে।

হল দখল প্রদর্শনের জন্যে ছাত্রদল দখলকৃত সব ক'টি হলে প্রথমেই হলগুলোর অতিথি কক্ষ থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলা হয়। হলের ছাদে মাইকে বাজানো হয় খালেদা জিয়া ও জিয়াউর রহমানের বক্তৃতার ক্যাসেট।

ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সরিয়ে দিয়ে ছাত্রদল এলেও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি এতোটুকুও। বরং হলগুলো দখলে রাখা নিয়ে ছাত্রদলের ক্যাডার গ্রুপগুলোর দ্বন্দ্বে পরিস্থিতি হয়ে পড়ে সংঘাতমুখী ও জঙ্গি

ছাত্রদলের হল দখলের সময় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা প্রায় সবাই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে। তবে কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী এ সময় ছাত্রলীগ ছেড়ে ছাত্রদলে যোগও দিয়েছে। যারা যোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে মুহসীন হলের মুনির, বিপ্লব ও আলীম এবং সূর্যসেন হলের আমিন, বঙ্গবন্ধু হলের রুবেল উল্লেখযোগ্য। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় এরা প্রায় সবাই ছিঁচকে মাস্তানির জন্যে খ্যাত ছিলো। তবে বেশির ভাগ হলেই ছাত্রদলের সমর্থক, যারা এতোদিন নীরবে 'সাধারণ ছাত্র' হয়ে ছিলো—তারাই ছাত্রদলের মিছিল- স্লোগান শুরু করে।

ছাত্রদল ক্যাম্পাসের ১৪টি হলের মধ্যে ১৩টি দখলের পর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সেদিন আর দেখা যায়নি। পরদিন ৩ অক্টোবর ডাকসু ভবনের সামনে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেনের সভাপতিত্বে এক সমাবেশে ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করা হয়। এরপর ছাত্রলীগের দেড় শতাধিক সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো নেতাই আর ক্যাম্পাসে আসেননি। তবে সেদিন বিকেলে টিএসসিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিমের নেতৃত্ব ১৫/২০ জন ছাত্রলীগ কর্মী একটি ছোট মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে।

ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সরিয়ে দিয়ে ছাত্রদল এলেও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি এতোটুকুও। বরং হলগুলো দখলে রাখা নিয়ে ছাত্রদলের ক্যাডার গ্রুপগুলোর দ্বন্দ্বে পরিস্থিতি হয়ে পড়ে সংঘাতমুখী ও জঙ্গি। এবং আবারো একই ভাবে, যেভাবে ছাত্রলীগ চালিয়েছিলো, তার আগে যেভাবে ছাত্রদল চালিয়েছিলো— সাধারণ ছাত্রদের ডাকা হয় মিছিলে। রুমে রুমে বখাটে চেহারার যুবকরা গিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মিছিলে আসতে বাধ্য করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের ৩টি গ্রুপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখলে রাখতে তৎপর রয়েছে। ছাত্রদলের সভাপতি নাসিরুদ্দিন আহমেদ পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক সাহাবউদ্দিন লাল্টু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি (সাবেক বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা) মনির হোসেন ৩টি গ্রুপের নেপথ্যে রয়েছেন। দখল অভিযানের শুরুতে মূলত পিন্টু গ্রুপের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মামুন ও সাংগঠনিক সম্পাদক দখলদারিত্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলো। কিন্তু দু'দিন পরই লাল্টু ও মনির গ্রুপের সমর্থকরাও চারটি হলে প্রাধান্য লাভ করে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলে পুরোপুরি ও জসীম উদ্‌দীন হলে আংশিক মনির হোসেনের সমর্থকদের প্রাধান্য রয়েছে। জগন্নাথ হল ও এএফ রহমান হল দখলে রেখেছে লাল্টু গ্রুপের সমর্থকরা। আর বাকি সব হলই নিয়ন্ত্রণে রেখেছে পিন্টু গ্রুপ। তবে সব হলেই পিন্টুর সমর্থক ৩/৪ জন কর্মী রয়েছেন।

জানা গেছে ছাত্রদল নেতা টিটো, মোর্শেদ,আতিক জসীম উদ্‌দীন হলে, মামুন, ফরহাদ ও সাঈদ সূর্যসেন হলে, মুহসীন হলে শিশির ও নাহিন, জিয়া হলে আসাদ, বাবু ও কুদ্দুস, এসএম হলে সোহাগ ও টগর, এএফ রহমান হলে উজ্জ্বল, সাইদুর রহমান, আজম দখলকৃত হলে ছাত্রদলের কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে জিয়া হলে পিন্টু গ্রুপের দু'টি উপগ্রুপ রয়েছে। জানা গেছে, পিন্টু গ্রুপের আসাদ সমর্থকরা এ হল দখলে নেয়ার পর সাবেক সভাপতি জাকির খানের একদল ক্যাডারও জিয়া হলে প্রবেশ করে। শেষ পর্যন্ত এ হলে দু'টি উপগ্রুপই রয়েছে। আসাদের সমর্থকরা হলের দক্ষিণ ব্লকে এবং জাকির খানের ক্যাডাররা উত্তর ব্লকে রয়েছে।

ছাত্রদলের দখল অভিযানে পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈধ ছাত্রত্ব রয়েছে, এমন

শতাধিক কর্মী প্রতিদিন ছাত্রদলের মিছিল-সমাবেশে যোগ দিলেও হলগুলো পরিপূর্ণ হয়ে আছে অছাত্র, বহিরাগত, সন্ত্রাসী ও মাস্তানে। দু'একটি হল বাদে কোনো হলেই ছাত্রদলের ছাত্রকর্মীরা গুরুত্ব পাচ্ছে না। হলের গেট, ছাদ, টিভি রুম সর্বত্র অস্ত্রধারীদের, বহিরাগতদের দোর্দণ্ড প্রতাপ সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ছাত্রদলের কর্মী তাদের বেশিরভাগই হয় লাল্টু নয় মনির হোসেনের সমর্থক। সভাপতি পিন্টুর সক্রিয় সমর্থকের সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই কম। এ কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের হাত থেকে বাঁচিয়ে হলগুলো রক্ষা করতে পিন্টু গ্রুপকে বহিরাগত ক্যাডারদের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে। প্রথমে লালবাগ, হাজারীবাগ ও পুরনো ঢাকার বহিরাগত যুবকরা হলে অবস্থান করে প্রথম ধাক্কা সামলালেও পরে নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সহকারীরা হলগুলোতে আস্তানা গেড়েছে। জানা গেছে, টোকাই সাগরের ৬/৭ জন ক্যাডার বঙ্গবন্ধু হলে ও সেভেন স্টার গ্রুপের দ্বিতীয় সারির ৭/৮ জন ক্যাডার জিয়া ও মুহসীন হলে অবস্থান নিয়েছে। খালেদা জিয়ার সরকার শপথ নেয়ার আগেই এ ক্যাডার নীলক্ষেত, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা কলেজ, পলাশী, শাহবাগ, কাঁটাবন এলাকায় চাঁদার ভাগ-বাটোয়ারায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

জানা গেছে, বহিরাগত সন্ত্রাসীদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ ছাত্র এমন ছাত্রদল কর্মীরা পাত্তা না পাওয়ায় গত ৫ অক্টোবর ডাকসু ভবনে মনির গ্রুপ ও লাল্টু গ্রুপ সমর্থক নেতা-কর্মীদের বৈঠক হয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, খালেদা জিয়া শপথ নেয়ার পরই হলগুলো থেকে বহিরাগতদের সরিয়ে তাদের স্থান করে দেয়ার জন্যে হাইকমাণ্ডের কাছে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একই দিন অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠকেও হলগুলোতে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের উপস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

তবে শেষ পর্যন্ত বহিরাগতরা সরে গিয়ে ছাত্রদলের ছাত্রত্বধারী কর্মীদের হাতে হলগুলো ফিরিয়ে দেবে কি না— এটা নিয়ে সংশিষ্টরা সন্দিহান। তবে মনির গ্রুপের সমর্থকরা বলছেন, নেত্রী শপথ নেয়ার পর হল ছাত্রদের হাতে না দেয়া হলে রক্তপাত অনিবার্য হয়ে পড়বে।

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাহাবউদ্দিন লাল্টু অবশ্য উপরোক্ত সব অভিযোগ পাশ কাটিয়ে বলেছেন, হল দখলের রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। হলগুলোতে বৈধ ছাত্ররা থাকবে এবং যে ছাত্র যে হলের সঙ্গে যুক্ত সে সেই হলে থাকবে। এমনকি ছাত্রলীগের কর্মীরা যথারীতি হলে থাকবে। তিনি ছাত্রলীগ সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের অবাঞ্ছিত করার ঘটনাটি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, যারা বৈধ ছাত্র এবং ক্যাম্পাসে আসতে যাদের কোনো আইনগত বাধা নেই, তারা ক্যাম্পাসে আসতে পারবে। আমরা ছাত্রলীগের মতো ক্যাম্পাসে দখল সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নই। সবাইকে নিয়ে রাজনীতি করতে চাই। বহিরাগত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনো হলে বহিরাগতরা থাকলে অবশ্যই উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। ক্ষমতা পরিবর্তনের পর যদি কোনো হলে কোনো বহিরাগত ঢুকে পড়ে সেটা হবে দুঃখজনক। দেশনেত্রীর বিজয়কে ব্ল্যাকমেল করার শামিল।

ক্যাম্পাসে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সাহাবউদ্দিন লাল্টুরা মুখে যাই বলুন নির্বাচনের পর ক্যাম্পাস নিয়ে তারা ভালো 'খেল' দেখিয়েছেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর ক্যাম্পাসের সবগুলো হল দখলে আনতে ছাত্রলীগের আড়াই বছর সময় লেগেছিলো। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসার সময় ছাত্রলীগের দখলে জগন্নাথ হল, জহুরুল হক হল, এসএম হল, এএফ রহমান ও শহীদুল্লাহ হল ছিলো। উত্তরপাড়ার ৪টি হলে ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণ ছিলো পরবর্তী আড়াই বছর। ১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল কেন্দ্রীয় নেতা পার্থ আচার্য ছাত্রদলের সঙ্গে এক বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়ার পর ছাত্রলীগ সে হলগুলোও দখল করে নেয়। এতেই সবগুলো হলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আসে ছাত্রলীগের। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদল সে সময়টুকুও নেয়নি। ছেলেদের হল তো বটেই, মেয়েদের হলগুলোও দখলে নিয়ে নিয়েছে।

ক্যাম্পাসে ১৩ টি হল দখলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের পলিটিক্সের হিসাবও পাল্টে যায়। বিরোধীদল সুলভ 'সংগ্রাম' থেকে সরে গিয়ে ছাত্রদল ভূমিকা নেয় 'সরকারি দলের'। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ১৫ দিন থেকে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রদল যে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেছিলো, সেটি গত ৫ অক্টোবর বিকেলে সংবাদ সম্মেলন ডেকে ছাত্রদল স্থগিত করে। তবে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল নেতারা বলেন, তারা উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি থেকে সরে আসেননি, শিগগিরই বিকল্প ধারায় আন্দোলন শুরু করবেন। কিন্তু বিকল্প ধারাটি কি হবে—সেটি বলেননি। উল্লেখ্য, ছাত্রদল গত ২৯ জুলাই থেকে এ লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেছিলো।

৫ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বৃহত্তম ৬৫ দিনের ছাত্র ধর্মঘট শেষ হওয়া সত্ত্বেও ৬ অক্টোবর ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। হল দখল, বেদখল, সংঘর্ষের আশঙ্কায় ক্যাম্পাসে আসেনি অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্রদলের ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বর্ষের মোট ৫শ' ৮৮টি পরীক্ষা স্থগিত করেছেন। কর্তৃপক্ষ বলছেন, যদি কোনো প্রকার বিরতি না দিয়ে পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করতে হয়, তবে অন্তত ৪ মাস সময় লাগবে সব পরীক্ষা শেষ করতে। কিন্তু সামনের দিনগুলোতে বিঘ্নহীন ৪ মাস সময় পাওয়া খুবই অনিশ্চিত। যদি আওয়ামী লীগ আন্দোলনের পথ বেছে নেয়, তবে ভার্সিটি এই চারমাসে কয়েক দফা অনির্ধারিত বন্ধের সম্মুখীন হতে পারে। সব মিলিয়ে ধর্মঘটে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তত ৬ মাসের সেশনজ্যামে পড়তে হতে পারে।

ছাত্রদল কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব হল দখলের পর ক্যাম্পাসে এখন সবচে' আলোচিত বিষয় হচ্ছে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী পদত্যাগ করবেন কি না। এ বিষয়ে উপাচার্যের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তিনি পদত্যাগ করবেন না। কিন্তু তার এ ঘোষণার পরও ছাত্রদল ধর্মঘট প্রত্যাহারের পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক আরো জোরালো হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, সরকারি দল হওয়ার পর ছাত্রদল নেতারা এখন বাস্তবতা বুঝতে শুরু করেছেন। ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুসারে উপাচার্য সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ায় সরাসরি তাকে অপসারণের কোনো বিধান নেই। তবে তিনি পদত্যাগ করলে সে পদে সিনেট কর্তৃক কাউকে নির্বাচনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ৮৯ সদস্যবিশিষ্ট সিনেটেও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ফলে অধ্যাপক আজাদ চৌধুরীকে সরিয়ে স্ব দলের অন্য কাউকে বসানো বিএনপি হাইকমাণ্ডের পক্ষে কঠিন।

জানা গেছে, আইনগত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার পরও উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী নির্দিষ্ট সময় পর পদত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে আওয়ামী লীগের পুনঃনির্বাচন ঘোষণা দেয়ার দাবিটি। সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছেন, উপাচার্য নিজে থেকে পদত্যাগ করলে তা এক অর্থে নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি সম্মান জানানো হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ৬ অক্টোবর শনিবার টিএসসিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থক শিক্ষকদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, বিএনপি সরকারিভাবে চাপ সৃষ্টি না করলে উপাচার্যের তরফ থেকে পদত্যাগের কথা চিন্তাও করা হবে না।

এ পরিস্থিতিতে উপাচার্য ইস্যুতে ছাত্রদল কি অবস্থান নেয়, সেটিই দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

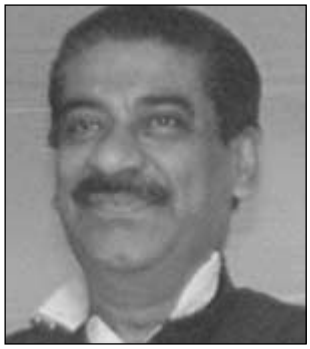

হাসানাত আবদুল্লাহ

সাবেক চীফ হুইপ
হেরেছেন বরিশাল-১ এবং ২ থেকে
যথাক্রমে ১৪০৩১ ও ১৫২৪৫ ভোটে

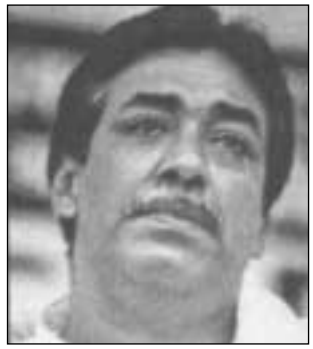

শামীম ওসমান

নারায়ণগঞ্জের গডফাদার
হেরেছেন নারায়ণগঞ্জ-২ থেকে
৩১২১১ ভোটে

মহিউদ্দিন খান আলমগীর

সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী
হেরেছেন চাঁদপুর-১ থেকে
২৭০৩০ ভোটে

শেখ রেহানা

পরবর্তী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী?

আন্দোলনের ডাক দিয়ে দেশ ছাড়লেন

রিপোর্ট **ফরিদ আহমেদ**

বাস্তবে প্রায় অসম্ভব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা পাশে তাকিয়ে দেখলেন অনেকেই নেই। তারা পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে। কেউ জনরোষের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে, আর কেউ কেউ গত ৫ বছরে নানা উপায়ে অর্জিত অর্থের নিরাপদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। দেশছাড়াদের তালিকায় রয়েছেন অনেক রাঘববোয়াল, যাদের হুঙ্কারে তাদের সমর্থকরাই ছিল কেঁচো হয়ে। মন খারাপ করে শেখ হাসিনার সহোদর বোন রেহানাও চলে গেছেন।

এরা কেউ সড়ক পথে রাতের আঁধারে, কেউ বিমানে চড়ে দেশ ত্যাগ করেছেন। কেউ গেছেন ভারতে, কেউ কেউ কানাডা, লন্ডন, সিঙ্গাপুরে। আরো অনেকের পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দেশের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাদের এতোদিনকার 'স্যার'দের ওপর নজরদারি বৃদ্ধি করেছেন। দেশে নির্বাচন আরো অনেক হয়েছে। কিন্তু এমন দেশত্যাগের হিড়িক পড়েনি।

১ অক্টোবর জনগণের ভোটের সোজা সাপ্টা জবাবে নির্বাক হয়েছেন অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীই। কিন্তু দেশত্যাগের নজির স্থাপন করলেন সাবেক সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ, 'জনতার মঞ্চ' খ্যাত মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সাবেক সাংসদ শামীম ওসমান, ফেনীর সর্বাধিক উচ্চারিত নাম জয়নাল হাজারীসহ প্রায় ডজনখানেক তারকা। কমপক্ষে আরো পাঁচ বছর জেলে থাকতে চাননি এরশাদও। তাই অসুস্থতার দোহাই দিয়ে তিনিও পাড়ি জমিয়েছেন লন্ডনে নির্বাচনের পরদিনই। যাবার আগে অবশ্য এরশাদ তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অন্যতম চাল চালতে ভুলে যাননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং ভাবী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন আর 'মোবারকবাদ' জানাতে ভুল করেননি।

আওয়ামী লীগের যারা দেশ ছেড়েছেন তাদের অনেকেই ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেননি। দরজা হিসেবে বেছে নিয়েছেন কেউ বিমানবন্দর আবার কেউ স্থলবন্দর।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ম.খা. আলমগীর গত ৪ অক্টোবর দুপুরে থাই এয়ারওয়েজের বিমানে করে চলে যান সিঙ্গাপুর। শেখ হাসিনার ক্যাবিনেটের এই টেকনোক্র্যাট প্রতিমন্ত্রী চাঁদপুর-১ আসনে চারদলীয় প্রার্থী এহসানুল হক মিলনের কাছে পরাজিত হন শোচনীয়ভাবে। খুব গোপনে চলে যাবার পাঁয়তারা করলেও এ খবর চাউর হয়ে যায়। বিমানবন্দরে বিদেশী এক এয়ারওয়েজের একজন কর্মকর্তা এ প্রতিবেদককে জানান, 'বিষণ্ন আলমগীর সাহেবকে ক্যাজুয়াল পোশাকে অত্যন্ত দ্রুত বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে দেখেছি।' সাবেক চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলের প্রেসিডিয়ামের সভায় চরম ভর্ৎসনার সম্মুখীন হন স্বয়ং শেখ হাসিনার কাছেই। জানা

যায়, পুত্রদের কারণে নেত্রীর সমালোচনার মুখে আব্দুল্লাহ কেঁদে ফেলেন। শনিবার তার দুই সমালোচিত পুত্র সাদিক ও আসিক আব্দুল্লাহকে নিয়ে চলে যান লন্ডন। সেখানে তিনি বাড়ি কিনে রেখেছিলেন ক্ষমতায় থাকাকালীনই।

নারায়ণগঞ্জের বহুল আলোচিত সাবেক সাংসদ শামীম ওসমান বেনাপোল চেকপোস্ট সংলগ্ন বাঁশতলা দিয়ে ভারতে চলে গেছেন বলে জানা গেছে। নারায়ণগঞ্জের কিছু সূত্র জানায়, ভারত থেকে তিনি কানাডা চলে যান যেখানে তিনি আগেই একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনে রেখেছিলেন। দেশ ছাড়ার প্রাক্কালে শামীম তার স্ত্রী পুত্রদের ফেলে রেখে গেছেন বলে জানা গেছে। বেনাপোলের একটি সূত্র ২০০০কে জানায়, একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী শামীম ওসমানকে সীমান্তে দেখেছে। এ সময় তার সঙ্গে আরো দু'জন ছিল বলে তারা জানায়। শামীম ওসমান বেশিরভাগ সময় পাজামা পাঞ্জাবি পরলেও সেদিন হাফ শার্ট, সাধারণ প্যান্ট এবং স্যান্ডেল পরিহিত অবস্থায় ছিলেন।

ফেনীর ত্রাস জয়নাল হাজারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুহুর্মুহু অভিযানে টিকতে না পেরে ত্রিপুরার একিনপুরে চলে গিয়েছিলেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশে প্রবেশ করলেও অজ্ঞাত স্থান থেকে নির্বাচন পরিচালনা করছিলেন তিনি। কিন্তু নির্বাচনে ভরাডুবি তাকে নির্বাচনের রাতেই দেশ ছাড়তে বাধ্য করে।

শীর্ষ সমালোচিত আওয়ামী লীগ নেতাদের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বলয়ের বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব হাসান ইমামও দেশ ত্যাগ করেছেন। অসংখ্যবার তার বাসায় ও অফিসে ফোন করেও তাকে পাওয়া যায়নি। দেশ ছাড়ার প্রাক্কালে এরা কেউই দলীয় নেতা কিংবা কর্মীদের জানাননি। দেশত্যাগের তালিকায় ডা. এইচবিএম ইকবাল, কামাল আহমেদ মজুমদার, হাজী মকবুল আহমেদ, হাজী সেলিম, এরশাদের ভাই জিএম কাদেরসহ আরো কয়েকজনের নাম শোনা গেলেও তারা এখনো যাননি। এরই মধ্যে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট সতর্ক হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। আওয়ামী সরকারের পাঁচ বছরে ক্ষমতায় থাকাকালীন ৮৫ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে প্রধানমন্ত্রীসহ ২৭ মন্ত্রী এবং ৭০ এমপি'র বিরুদ্ধে। এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছিল বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। এই তালিকায় বিএনপি'র ১৫ জন, জাপার ৯ জনসহ কিছু মহিলা এমপিও রয়েছেন। রয়েছেন কিছু ব্যবসায়ীও। গত ৫ বছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

ঠিকানাবিহীন এরশাদ

জয়নাল হাজারী : কোন্ সুদূরে...

ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে ১৫১টি মামলা দায়ের হলেও সেগুলো ছিল চাপা পড়ে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো অচিরেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মিগ-২৯ ও নৌবাহিনীর ফ্রিগেট সংক্রান্ত, সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ও ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী নাসিমের বিরুদ্ধে ১৭৫ জনকে বিসিএস চাকরিতে ৩ লাখ টাকা করে উৎকোচ নিয়ে চাকরি প্রদান সংক্রান্ত, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ, সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশাররফ, চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ, শ্রম ও জনশক্তিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সাজেদা চৌধুরী, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন এসব আওয়ামী লীগ নেতারা মামলায় গ্রেপ্তার এড়াতে গা ঢাকা দেবেন না দেশত্যাগ করবেন তাই দেখার বিষয়। শুধু নেতারাই নয়, গত ৫ বছরে এদের পোষ্য বিভিন্ন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ক্যাডার ও হিটম্যানরা স্থলপথে বেনাপোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, হিলিসহ বিভিন্ন পথে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে গেছেন। দেশত্যাদের সময় এরা ছদ্মনাম ব্যবহার করে ভুয়া পাসপোর্টের মাধ্যমে সীমান্ত পার হয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানিয়েছে। ঢাকার কামাল মজুমদারের ছেলে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শিপু হত্যার নায়ক জুয়েলকে নির্বাচনের আগে পিতার সমর্থনে বেশ কয়েকটি সভা-সমাবেশে অংশ নিতে দেখা গেছে। হাজী সেলিমের ক্যাডার নাইন শুটারগান লিটন এবং ডা. ইকবালের দেহরক্ষীরা প্রথমে আত্মগোপন করলেও বর্তমানে ভারতে আছে বলে প্রকাশ।

মালিবাগ হত্যাকান্ডের হোতা নুরুন্নবী শাওন, মিঠু, কমান্ডো দুলাল, আরমান, লোটাস, পাপ্পু, বাদল, দীপ্তি, মহাখালীর বাবু, মধু এরা শুক্রবার সকালে ঢাকা ছেড়েছে বলে তাদের পরিচিত সূত্রগুলো জানিয়েছে। সূত্র আরো জানায়, এরা কলকাতায় হোটেল গুলশান ইন্টারন্যাশনালে উঠেছে। অন্যদিকে সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রমের পুত্র দীপু চৌধুরীর একান্ত সহযোগী পার্টনার বিমানবন্দর এলাকার ত্রাস রানা, কাশেম, গৌতম, নাসির, খোকন, দুলাল, আসিফ ও ডাবলু ঢাকা ত্যাগ করেছে ইতিমধ্যে। জানা গেছে, দীপুর সহযোগীরা কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের ভিআইপি হোটেল ও সদর স্ট্রিটের শিলটন আবাসিক হোটেলে গিয়ে প্রথমে উঠেছে। রাজধানীর শাহজাহানপুর, মতিঝিল ও খিলগাঁও এলাকার ত্রাস মানিক ও দেবাশীষ এবং শামীম ওসমানের ক্যাডার সারোয়ার, আগা মিঠু, মাসুদ ভারতে অবস্থান করছে কলকাতার প্রিন্স হোটেলে। হাজী মকবুলের পুত্র মাসুদ, তার সহযোগী আরমান, ওসমান, লতা মাসুদ, আদনান, আকবরও কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছে। মালিবাগ, মহাখালী, তেজগাঁও এলাকার কিরন, পিচ্চি হান্নান, ইস্কাটনের হালিম ও আজাদ স্থলপথে নাম পরিবর্তন করে পালিয়ে গেছে। বরিশালের দুর্ধর্ষ ক্যাডার জসীম পানামা ফারুক, ছক্কু, মিল্টন, আফতাব পারভেজ, বাশার, রানা, মান্নান, মোনায়েম, মামা খোকন বেনাপোল হয়ে ভারতে চলে গেছে। এরা সবাই ছিল হাসানাতের ক্যাডার। এসব ক্যাডার গ্রুপগুলো কলকাতায় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখছে। পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে এলে দেশে ফেরত আসবে অনেকেই। গড়ে ১০ থেকে ২০টি মামলা মাথায় নিয়ে এদের অনেকে ভারত থেকে ইটালিসহ অন্যান্য দেশে চলে যাবে বলে জানা গেছে।

বিএনপিতে নতুনদের জয়জয়কার আওয়ামী লীগে...

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১১৬টি আসনে প্রার্থিতায় পরিবর্তন এনেছিল। '৯৬-এর নির্বাচনের প্রার্থীদের পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগ ভালো করতে পারেনি। পরিবর্তিত ১১৬টির মধ্যে মাত্র ১৪টি আসন পেয়েছে আওয়ামী লীগ। ১৪টির মধ্যে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা একাই জিতেছেন ৩টিতে। একটিতে জিতেছেন প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক। এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শীর্ষ প্রায় সকল নেতাকে একাধিক আসনে প্রার্থী করা হয়। কিন্তু তোফায়েল আহমেদ, আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ নাসিমের মত নেতারা একাধিক আসনে হেরেছেন। শেখ হাসিনা, আমির হোসেন, সুরঞ্জিত, মতিয়া চৌধুরীর মত অসংখ্য শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ১টি করে আসনে ফেল করেছেন।

অন্যদিকে বিএনপি প্রার্থী পরিবর্তন করেছিল ১৫২টির মধ্যে ৭৩টি আসনে। ৭৩টির মধ্যে মাত্র ১১টি ছাড়া বাকি ৬২টি আসনে বিএনপি'র পরিবর্তিত প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে।

৭ম সংসদ নির্বাচনে নীলফামারী-১ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবদুর রউফ জাতীয় পার্টির প্রার্থী এন, কে আলম চৌধুরীর কাছে ১২ হাজার ৬১১ ভোটে হেরেছিল। এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরিবর্তিত প্রার্থী ড. হামিদা বানু শোভা এন, কে আলমকে ১ হাজার ৩২৫ ভোটে পরাজিত করেন।

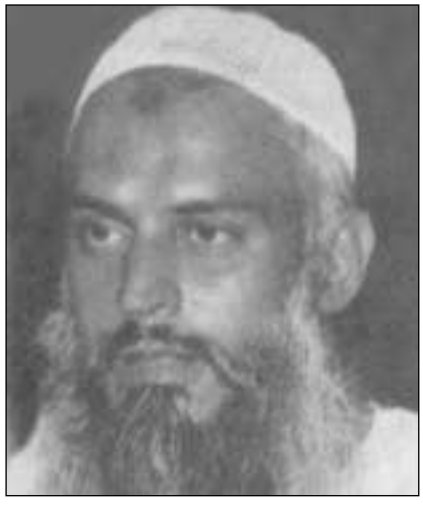

দল পরিবর্তন করে চতুর্থবারের মতো জিতলেন মোফাজ্জেল হোসেন কায়কোবাদ

শেষ মুহূর্তে বিএনপিতে যোগ দিয়ে জিতলেন এম এ হাশেম

নীলফামারী-২ আসনে আওয়ামী লীগের পরিবর্তিত প্রার্থী জনপ্রিয় অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর জামায়াত প্রার্থীকে ৪ হাজার ১২৮ ভোটে পরাজিত করেন। ৭ম সংসদে এ আসনে নির্বাচিত হয়েছিল জাতীয় পার্টির আহসান আহমেদ। '৯৬-এর নির্বাচনে নড়াইলের ২টি আসন বিপুল ব্যবধানে জিতেছিলো আওয়ামী লীগ। দলীয় কোন্দল ঠেকাতে শেখ হাসিনা এবার আসন ২টিতে প্রার্থী হন। শেখ হাসিনা ২টিতেই জয়লাভ করলেও তিনি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হন। অন্যদিকে তিনি নিজ শ্বশুরবাড়ির আসন রংপুর-৬ -এ প্রথম বারের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান।

রংপুর-১ আসনে জাতীয় পার্টির গতবারের এমপি শরফুদ্দিন আহমদ ঝন্টুকে শেষ মুহূর্তে দলে টেনে মনোনয়ন দিয়ে শেষ রক্ষা হয়নি আওয়ামী লীগের। ঝন্টু জাতীয় পার্টির প্রার্থী মশিউর রহমান রাঙার কাছে বিপুল ব্যবধানে হেরে যান।

সাবেক বিএনপি নেতা মাহবুবুল আলম তারাকে বাগিয়ে এনে ফেনী-৩ থেকে মনোনয়ন দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু তারা বিএনপি প্রার্থী মোশাররফ হোসেনের কাছে ৫২ হাজার ১১১ ভোটে হেরে যান।

খালেদা জিয়ার সাবেক উপদেষ্টা আ: রব চৌধুরী বিএনপি থেকে মনোনয়ন না পেয়ে আওয়ামী লীগের টিকেটে লক্ষ্মীপুর-৪ থেকে

মুহিত হেরেছেন, দলও হেরেছে আবার অর্থমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হল না

টাকা জেতাতে পারেনি নূর আলীকে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোট পাওয়ার দৌড়ে তিনি ৩য় অবস্থানে।

বিভিন্ন দলের ক্ষুব্ধ নেতাদের দলে টেনে মনোনয়ন দেয়ার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধনকুবের এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাকে মনোনয়ন দিয়েছিল। ঢাকা-১ আসনে ঋণখেলাপি, বই খেলাপি, সালমান রহমান কোটি কোটি টাকা বিলিয়েও বিএনপির নাজমুল হুদাকে হারাতে পারেননি।

ঢাকা-২ আসনে অপর এক ধনকুবের নূর আলী শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন বিএনপি'র আঃ মান্নানের কাছে।

সাবেক সেনা প্রধান মোস্তাফিজুর রহমান আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়েছিলেন রংপুর সদর থেকে। তিনি হারাতে পারেননি এরশাদের প্রার্থীকে। এভাবে ১০২টি আসনে আওয়ামী লীগের পরবর্তিত প্রার্থীরা ব্যর্থ হয়েছেন।

বিএনপি'র তরুণরা এগিয়ে

বেগম জিয়ার পুত্র তারেক জিয়া বিএনপির প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করায়, এবারের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখক নতুন মুখ বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছিল। নতুনরা দলকে হতাশ করেনি। কুমিল্লা-৩ আসনে বিএনপি মনোনয়ন দিয়েছিল জাতীয় পার্টির সাবেক এমপি মোফাজ্জেল হোসেন কায়কোবাদকে। কায়কোবাদ আওয়ামী লীগ প্রার্থী ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুণকে ২৪ হাজার ২১০ ভোটে পরাজিত করেন।

পারটেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ধনকুবের এম এ হাশেম নির্বাচনের আগ মুহূর্তে বিএনপিতে যোগ দিয়ে মনোনয়ন নেন নোয়াখালী-২ থেকে। তিনি আওয়ামী লীগে নবাগত ডা. জাফরুল্লাহকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেন।

বাগেরহাট-২ থেকে বিএনপি মনোনয়ন দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী এমএএইচ সেলিমকে (সিলভার সেলিম)। সেলিম শেখ হাসিনার চাচাত ভাই শেখ হেলাল উদ্দিনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

বিএনপি'র ধনকুবেরদের পাশাপাশি বেশির ভাগ আমলারাও নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছে নির্বিঘ্নে। অর্থ, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ দেখে মনোনয়ন দেয়ায় কয়েকটি জায়গায় বিএনপি প্রার্থী হেরে গেছেন।

সিলেট-৬ আসনে বিএনপি মনোনয়ন দিয়েছিল জাতীয় পার্টি থেকে আসা ব্যারিস্টার আবদুল হাসিবকে। হাসিব মাত্র ৬০৭ ভোট পেয়েছেন। ঐ আসনে বিএনপির ত্যাগী নেতা সৈয়দ মকবুল হোসেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে নির্বাচতি হয়েছেন। শরিয়তপুর-১ আসনে আলতাফ হোসেন সিকদার বিএনপি'র মনোনয়ন পেয়ে ভোট

দল হেরেছে তবে আসাদুজ্জামান নূর জিতেছেন

এম এ এইচ সেলিম

খোকাকে হারাতে পারেননি খোকন

পেয়েছেন মাত্র ৭৩৪টি। বিএনপি নেতা কর্মীরা আলতাফ হোসেনকে বয়কট করে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হেমায়েত উল্লাহ আওরঙ্গের নির্বাচন করেছেন।

গাজীপুর-২ আসনে বিএনপি দলের পরীক্ষিত নেতা সাবেক মন্ত্রী অধ্যাপক এমএ মান্নানকে বাদ দিয়ে প্রার্থী করেছিল হাসান উদ্দিন সরকারকে। হাসান উদ্দিন সরকার স্বতন্ত্র এম.এ মান্নানের চেয়ে কম ভোট পেয়ে ৩য় হয়েছেন। এখানে এমএ মান্নানকে প্রার্থী করলে বিএনপি এ আসনটি পেয়ে যেত।

পটুয়াখালী-৪ আসনে তারেক জিয়ার অনুকূল্যে মনোনয়ন পেয়েছিলেন শিল্পপতি আতিকুর রহমান। এ এলাকায় বিএনপি'র ত্যাগী নেতা মোস্তাফিজুর রহমান স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে ২য় হন। এ আসনে বিএনপির ভোট এভাবে বিভক্ত না হয়ে গেলে আসনটি বিএনপি'র পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এভাবে আরো প্রায় ৩৫টি আসনে বিএনপি ত্যাগী নেতাদের পাশ কাটিয়ে মনোনয়ন দিয়েছে। এর ফলাফল ভাল নাও হতে পারত। কিন্তু আওয়ামী লীগের বিরোধী সেন্টিমেন্ট প্রবল হয়ে ওঠায় বিএনপি যাকেই প্রার্থী করেছে মানুষ তাকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভোট দিয়েছে।

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ সন্ত্রাসী লালন, সন্ত্রাসী গডফাদারদের মনোনয়ন। ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ যেসব টাকার কুমির এবং আমলাকে মনোনয়ন দিয়েছে মানুষ তাদেরও প্রত্যাখ্যান করেছে। সন্ত্রাসী এবং দুর্নীতিবাজদের রাজনৈতিক দলগুলো আপন করে নিলেও ভোটাররা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে এবারের নির্বাচনে।